সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ‘মাংসখেকো ঘোড়া’ : বিনির্মিত পরিসরের সন্ধানে

Sadhon Chattopadhyay's Short Story ‘Flesh-Eating Horse’ : Exploring The Deconstructed Space

প্রিয়কান্ত নাথ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
শিলচর - ৭৮৮০১১
আসাম, ভারত

Abstract :
Sadhon Chattopadhyay's short story ‘flesh eating horse’ to see how the tale first builds and then breaks its own world. The horse, which eats human flesh is more than a frightening animal – it is a moving sign that upsets daily human life. As fear spreads, the lines between safe and dangerous, human and animal, real and imagined start to blur. The story’s switching narrator, sudden jumps in time and unfinished hints deepen this feeling of confusion. The story shows that, space is never fixed. It is shaped by people's thoughts, memories and worries, and it can fall apart when a shock arrives. By showing this break-up of space, Sadhon Chattopadhyay challenges old power rules and reminds us how quickly men's thinking can change the world.

Key words : Horse, Animal, Human being, Power, Space, World.

“অতীতেও লড়েছিল ওরা মরে ছিল নামহীন/
তারো পরে হাজার হাজার বছর/
বহু মত ও পথের সিদ্ধান্তে/
নয়া নয়া নীতির ধ্বজা ঘাড়ে/
লড়ে চলেছে ওরা নামহীন আঠারো অক্ষৌহিনী/
বিশ্বস্ত প্রশ্নহীন যোদ্ধারা লড়ে চলে/
লেখা হয়ে চলে ইতিহাস/
ধ্বংস আর নব-নির্মাণের মাঝে/
অখ্যাত সেই কোটিদের নাম কী” ১

– সভ্যতার অগ্রগতির নিয়মই হয়তো এই! অগ্রগতির ইতিহাসের সৌধ দাঁড়ায় আসলে তাদেরই উপর ভিত্তি করে, যারা অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে নিজেরা পিছিয়ে পড়ে ক্রমাগত কার্ল মার্কস-এর “History as a class struggle and progress as a process through the struggle for power among different social classes” ২ – এই দৃষ্টিভঙ্গিগত ধারণাকেই সহায়ক-সূত্র হিসেবে মেনে নিয়ে আনতোনিও গ্রামশি ‘Subaltern’ শব্দটি প্রয়োগ করেন যার বিপরীতে থাকে ‘Dominant’ শব্দটি রণজিৎ গুহ কৃত ‘নিম্নবর্গ’ এই পারিভাষিক বাংলা শব্দটি যেমন শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর নয়, তেমনি ‘আধিপত্যবাদী’ শব্দটিও ক্ষমতা বিন্যাসের এক জটিল প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করে যা আসলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অধিকারের সীমানাকেই বিস্তৃত করে এবং যার বিপরীতে থাকে ‘শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে’ কাজ করা অপর মেরুর অধিবাসীরা যাদের মূক মুখে কোনোদিনই ভাষা ফুটে ওঠে না

ফলশ্রুতিতে, সমাজ যত ‘সভ্য’ হয়েছে, সামন্ত শ্রেণীর আধিপত্য, পুঁজিবাদী শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ার আগ্রাসী মনোভাব উৎপাদন সম্পর্ক-রাষ্ট্রক্ষমতার বিন্যাস-অর্থনৈতিক মাপকাঠি-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন-সামাজিক জীবনধারা – সবকিছুতেই এক অ-সম মেরুকরণ ঘটিয়ে দেয় বিবর্তনের প্রক্রিয়া ধারাবাহিক ক্রম মেনে এই অবস্থায় এগোতে পারে না বলেই জীবন

যাপন তো বটেই – জীবন ধারণও হয়ে ওঠে আয়াসসাধ্য। আর ঔপনিবেশিক তত্ত্বাবধানে আমাদের দেশ বহুদিন ছিল বলেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই দেশীয় ও বহুজাতিক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের যাঁতাকলে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হয়েছে – হচ্ছে। বলা যেতে পারে, পুঁজিবাদী উৎপাদনে বিশ্বব্যাপী প্রসারে যে কোনো শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষই পরিগণিত হয়ে যায় নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত একটি জীব হিসেবে।

এবং এখান থেকেই শুরু হয় আমাদের পথ চলা। যেখানে সমস্ত পথই প্রভুত্বের কাছে গিয়ে মাথা নত করে, সেই অধীনতার সম্পর্ককেই আমরা আরও একবার বাজিয়ে নিতে চাই। মানববিশ্বকে পরিশুদ্ধ করে তোলার বিশুদ্ধ তাগিদে। এই তাগিদ সাধন চট্টোপাধ্যায়েরও। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি রমনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও বিরাজবালা দেবীর প্রথম পুত্র সাধন চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) বরিশাল জেলার শোলনা গ্রামে। পিতৃদত্ত নাম ছিল চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি ছোটবেলার ডাকনাম 'সাধন' ব্যবহার করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে চলে আসেন সপরিবারে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সমকালীন সময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বুঝে নিতে সচেষ্ট হন সাধন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে খাদ্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন এবং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'নন্দন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প 'বন্যা'। আজীবন তিনি সময়-সমাজ-রাজনীতিকে তাঁর সাহিত্যের অঙ্গনে স্থান দিয়েছেন। ১৯৭০-এর দশক এবং তার পরবর্তী সময়পর্বে বাংলা সাহিত্যের বাঁক বদলের অন্যতম রূপকার তিনি। বাস্তবতার সংজ্ঞাকে ক্রমাগত ভেঙে তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন এক কাঙ্খিত বাস্তবতাকে। সময়ের প্রতিটি বাঁক তাঁর মনে ছাপ ফেলেছে। সময়কে ক্রমাগত বিনির্মাণ করার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সাধন বলেন : "আসল কথা, লেখকের একটি দ্বিতীয় বাস্তব তৈরির লক্ষ্য আছে। সেটাই আসল। প্রথম বাস্তবটি খসে অপ্রয়োজনীয় হয়ে, স্থায়ী আকার লাভ করে এই দ্বিতীয় বাস্তব। আপাত লজিকহীনতা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার বাইরের ভূমিতে দাঁড়িয়ে, দ্বিতীয় বাস্তবের একটি ত্রিমাত্রিক রূপ সৃষ্টি করাই বোধহয়, সমসময়ের গল্পকারদের চেতনায় মুখ্য হয়ে উঠছে" ('সমসময়ের ছোটগল্প এবং কোয়ান্টা', 'কোরক', শারদীয় - ১৪০২)। চাক্ষুষ বাস্তব ও শিল্প বাস্তব – দুটো আলাদা ধরা হলেও সাধন বাস্তবের উপরিতল থেকে গভীরে নেমে যেতে সদা প্রস্তুত। ফলে, তাঁর ভাষায়, "আমি ব্যক্তির গল্প লিখলেও কিন্তু সেটা ঠিক একটা ব্যক্তির গল্প কখনও থাকতে পারে না। সে ব্যক্তির গল্প ধরেই তার অতীতের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আমি, আমার সামাজিক চেতনা, রাজনৈতিক চেতনা সমস্ত কিছুই মিলেমিশে আসে" ('আমার গল্প ভাবনা', 'উত্তরাধিকার', ১৯৯৬)।

সাধন চট্টোপাধ্যায় আজীবন তাঁর লেখক-সত্তাকে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এমন এক নতুন পরিসরে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, যেখানে বাস্তবতা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে ক্রমাগত। পরিসর সন্ধানের এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে, সাধনের ভাষায়, "লেখকের বোধ – যেখানে অন্বিত থাকে সমাজ, সময়, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন ও রাজনৈতিক জ্ঞানের পরম্পরা ও অন্তঃসম্পর্ক" ('আমার ভাবনা বলে কিছু নেই', 'উত্তরাধিকার', ১৯৯৬)। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প ভাবনা সম্পর্কে 'সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পবিশ্ব : বিনির্মাণের পরম্পরা' নামক প্রবন্ধে তপোধীর ভট্টাচার্য বলেন তাই : "বাংলা সাহিত্যে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বদলে এবং প্রতীচ্যাগত আধুনিকোত্তরবাদের আধিপত্য-প্রবণ চিন্তা পিঞ্জর এড়িয়ে পুরোপুরি নতুন ধরনের উত্তর আধুনিক চেতনার সৃষ্টি হয়েছে। এই চেতনার অভিজ্ঞতা হলো ক্রমিক উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা, বিষয় ও বিষয়ীর নিবিড় দ্বিবাচনিকতা, প্রকরণ ও অন্তর্বস্তুতে প্রাকৃতায়ন এবং নান্দনিক ও সামাজিক ভাবাদর্শের অন্বয়জাত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। সাধনের ছোটগল্পে এই সবই লক্ষ করি আমরা।" ৩

'ঢোল সমুদ্র', 'মেহগনি', 'মহারাজা দীর্ঘজীবী হোন', 'তৃণভূমি', 'মনোনয়ন', 'নাগপাশ', 'বেলা অবেলার কুশীলব', 'সময়ের গন্ধ', 'স্টীলের চঞ্চু', 'গান্ধারী' প্রভৃতি গল্প সহ চার শতাধিক ছোটগল্পের রচয়িতা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে লক্ষিত হয় গতিশীলতা। চলমান সমাজ জীবনকে তিনি দলিলীকরণে সিদ্ধহস্ত। সময়-সন্ধির প্রতিটি বাঁক সম্বন্ধে তিনি সচেতন। গল্পের চরিত্র এবং পাঠকের সংযোগ সন্ধানে তিনি সদা তৎপর। তাঁর রচনায় তাই লক্ষিত হয় বহির্বৃত সত্য অপেক্ষা অন্তর্বৃত সত্যের উত্তরোত্তর অনুসন্ধান। মূল্যবোধ, জীবন স্বপ্ন, বিপ্লব, রাজনীতি, গ্রামোন্নয়ন, আদর্শ কেমন করে বারবার তার পরিসর বদল করতে থাকে – সেই প্রেক্ষণ বিন্দুগুলি সাধন তাঁর গল্পে তুলে ধরতে চান সংবেদনশীল মানসিকতায়। নিঃসন্দেহে তিনি তাই অস্তিত্বতাত্ত্বিক। তাই ভগীরথ মিশ্র বলেন, তাঁর সম্বন্ধে : "সাহিত্য তাঁর কাছে বিনোদন তো নয়ই, নিছক শিল্পসৃষ্টিও নয়, সাহিত্য তাঁর জীবন দর্শনেরই শৈল্পিক প্রকাশ।" ৪

অর্থাৎ, ব্যক্তি-চৈতন্য ও সামাজিক-চৈতন্যের কোলাজে মানুষের শেকড় সন্ধানও জরুরি হয়ে ওঠে তাঁর কাছে। কেননা, তিনি জানেন, 'নিছক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব দিয়ে এ বাস্তবের স্বরূপ প্রকাশ সম্ভব হবে না।' তাই বর্তমান ইতিহাসকে কাটাছেঁড়া করেই তিনি অতীতকে অনুভব করতে পারেন এবং আমরা পেয়ে যাই বর্তমানকে ভেঙে ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করার অনুচ্চ কিন্তু জোরালো আত্মপ্রত্যয় তাঁর লেখায়। 'সাধন চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্ববিশ্ব ও জীবনভাষ্য' প্রবন্ধে শুভঙ্কর ঘোষও বলেন তাই : "প্রকৃতপক্ষে যে দেশকালের আবহমন্ডলে সাধন গড়ে উঠেছেন, সময়ের স্তরে স্তরে যে অভিজ্ঞতাসমূহ অর্জন করেছেন, বড় বড় গণআন্দোলন, মতাদর্শগত সংঘাত, আর্থসামাজিক ভাঙচুর, ব্যক্তি ও সমাজের টানাপোড়েন, মনুষ্যত্বের হত্যা ও প্রতিরোধ – এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর মননবিশ্ব ও সাহিত্যবীক্ষার সমৃদ্ধ হওয়া।" ৫

এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে 'অনীক' পত্রিকায় প্রকাশিত সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'মাংসখেকো ঘোড়া' নামক ছোটগল্পটি আমাদের ভাবনার স্তরগুলো খুলে দেয়। বিশ্বায়নের হাত ধরে বহুজাতিক সংস্থার বিশাল বিজ্ঞাপনের জন্য ৫০ ফুটেরও বেশি উচ্চতায় কাজ করে চলেছে বিজলিপদ, পঞ্চানন, নীলু, যাদব। যে বিজ্ঞাপনের মধ্যে লাল-হলুদ আলোর রোশনাইতে ভেসে উঠবে 'সুকুমার ঊরুর মেয়ে' সহ রমণাকাঙ্ক্ষায় দীপ্ত একটি লাল ঘোড়ার ছবি। নীচে লেখা থাকবে – 'জীবন মানেই গতি।' কিন্তু সন্ধ্যার প্রাকমুহূর্তেই আচমকা একটি খাম্বা খসে সকাল থেকে কাজ চালিয়ে আসা এই কর্মী চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে একজনের (অর্থাৎ, বিজলিপদ) ডান হাতটি কনুই থেকে "বাতাসে ঢেউভাসা হয়ে মিলিয়ে গেল। শুধু-কনুইটা অর্ধেক অবস্থায় ঠুঁটো জেগে আছে" (পৃ. ১১)। কিন্তু চোখে ঘোর লাগা আলোর নেশায় শহুরে মানুষরা তার কোনো খবরই পেল না। যাদের খবরটুকু রাখা দরকার, তারাই বা রাখছিল কি! পঞ্চা কোম্পানির কর্তাদের টেলিফোনে খবর জানিয়েছিল। কিন্তু কর্তারা তার কথা বিশ্বাস করে নি। ঠিক যেমন বিশ্বাস করবে না বীমা কোম্পানিও। তাই পাঁচ তলার ছাদে চেতনার অতলে তলিয়ে যেতে থাকা বিজুকে (বিজলিপদ) রেখে পঞ্চা রেল লাইন ও ফ্লাইওভার, বস্তি, এঁদো নিচু জমি – সর্বত্র খুঁজতে চলে 'আঙুলে ঘোড়ার নালের আংটি' জড়ানো একটি কাটা হাত। কিন্তু 'পৃথিবীর কোনো শ্রবণ যন্ত্র'তেই যখন ধরা পড়েনি খসে পড়া হাতের পতন শব্দ, তখন ভূমিতলে কোথায়ই বা খুঁজে পাওয়া যাবে তাকে। আর বিচ্ছিন্ন হাতটি পেলেও "পুলিশ, জনতা, পার্টি – যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর জেরার মুখে পড়তে পারে" (পৃ. ১৫) সে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে পঞ্চা শেষ পর্যন্ত থানারই দ্বারস্থ হয়। অন্যদিকে "বিজলি চিৎ হয়ে অসাড়। বেঁচে কি মরে, টের পাওয়া যাবে না। ইতিমধ্যে ঘুমন্ত কনুই থেকে রক্ত ঝরতে শুরু" (পৃ. ১৭)। বিজুর এই অবস্থা দেখে নীলুও তার ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে ওঠে। আত্মপ্রত্যয়হীন নীলু বিজুর পাশে বসেই ঘুমিয়ে পড়ে। আর পঞ্চাকে নিয়ে শেষপর্যন্ত দুই মদ্যপ পুলিশ রহস্যময় সেই রাতে ছাদে ওঠে দেখে "নিঃশব্দে, নিরিবিলিতে, ফ্রেমের ঘোড়াটা লাফিয়ে নেমে এসে ঘুমন্ত নীলুর ডানহাতটি চিবিয়ে খাচ্ছে। আঙ্গুল, কব্জি, বল্টুর ঘষা জং, শিরা, ত্বক" (পৃ. ১৮) প্রভৃতি এবং তাদেরকে দেখেই "হলদে দাঁতে সামান্য চিঁহিঁ ভাব দেখিয়ে ঘোড়াটা সামান্য লাফ দিয়ে ফের ছবি হয়ে গেল" (পৃ. ১৮)।

সে কাহিনি পরদিন সংবাদপত্রে বেরোল, কিন্তু তা যে অবিশ্বাস্য কথা – তাই সেই কাহিনিকে কেউ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করল না! গল্পের সমাপ্তি বাক্য এরকম : "পরদিন সংবাদপত্রে সারা শহরে ঘরে ঘরে একটি লাল ঘোড়ার কাহিনি বেরোল কিন্তু কেউ বিশ্বাস করল না প্রাণীটা মনুষ্যহাত গিলে ফেলতে পারে কিনা" (পৃ. ১৮)।

২০০০ খ্রিস্টাব্দে 'অনীক' পত্রিকায় প্রকাশিত '৯৯৯৯৯' নামক/সংখ্যক গল্পে সাধন আমাদেরকে যেমন দেখিয়েছেন "চম্পক নগরীর আকাশে আজ বেলুন উড়বে। শহরের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, অফিসের ছাদ, ঝুলবারান্দা, বহুতল বাড়ির মাথা বা পার্ক, ময়দান, ফাঁকা জায়গা থেকে নাগরিকবৃন্দ ঘাড় তুললেই দেখবে বিশাল বুদবুদের মতো প্যারাসুট তৈরি, যন্ত্রপাতিসহ বায়ুযানগুলি বিশ-পঁচিশ হাত ওপরে শহরের আকাশে বিজ্ঞাপিত প্রদর্শনীর মতো ঝুলছে....." (পৃ. ৩৯); কিন্তু ওই গল্পের/শহরের নাগরিকবৃন্দ এটা যেমন দেখেনি যে, যান্ত্রিক সভ্যতার বিজ্ঞাপিত বেলুনের ভেতরের হাওয়াকে, তার উত্তাপকে – তেমনি আমাদের আলোচ্য গল্পের নাগরিকবৃন্দও সুসজ্জিত, উদ্দাম, বল্গাহীন অশ্বকেই শুধু দেখবে। দেখবে না বহুজাতিক সংস্থার সেই লাল ঘোড়ার রঙটুকু ফুটে উঠেছে রক্তে রাঙা হাতের বিনিময়ে। দেখবে না বিজু, নীলুরা তাদের বাপ ঠাকুরদাদার মতোই ক্রমাগত রাতের অসীম অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। 'সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে চিত্রকল্পের বাহার' নামক প্রবন্ধে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিবিড় পর্যবেক্ষণে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মানুষের প্রতি যে গভীর মায়া, মমতা ও আস্থা রয়েছে, সে সম্পর্কে সঠিকভাবে বলেন : "বদলে ফেলার আকাঙ্খাটি তাঁর ভেতরের শক্তিকে ঠেলা দেয় সর্বক্ষণ, এবং তিনি নিশিডাকা রাতের পথিক হয়ে অভিজ্ঞতার সম্পদ নিয়ে গল্পে উজাড় করে দেন দীনহীনের প্রতি আস্থা আর বিশ্বাস। এর ভেতরে কোনও ভান, ভনিতা, ভন্ডামি নেই।" ৬

ঘোড়া পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যে শক্তি-বীরত্ব-গতি-স্বাধীনতা ও মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কার্পেন্টারিয়ান সিম্বলিজমে ঘোড়া হচ্ছে 'objectified memory' – একটি বহির্জগতে বিদ্যমান বস্তুর মাধ্যমে অন্তর্জগতের অনুভবের প্রকাশ। ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অবচেতন বাসনার প্রতীক – ক্ষমতা, যৌনতা বা দমন-অভিপ্রায় প্রকাশের বাহক। লাকাঁয়ান বিশ্লেষণে ঘোড়া 'the other' – একটি কল্পিত বাস্তব মানসিক গঠন নির্মাণ করে। জেনেটের দৃষ্টিতে ঘোড়া একটি পুনরাবৃত্ত প্রতীক, যা বহু দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থবহ হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যেও তেমনি ঘোড়া বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে বহুমাত্রিক চিহ্নায়ক হয়ে। বাংলা কবিতায় ঘোড়া কেবল একটি প্রাণীর প্রতিরূপ নয়, বরং এটি সময়-গতি-শক্তি-যুদ্ধ অথবা স্বপ্ন ও মুক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কবির কল্পনার ভুবনে ঘোড়া একদিকে যেমন বাস্তবতার ইঙ্গিতবাহী, অন্যদিকে তেমনি অলৌকিক বা অবচেতনের রূপান্তরও। ঘোড়া একটি গতিশীল চিত্র যা পাঠ-কে বহুমাত্রিক ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি করে দেয়। জীবনানন্দ দাশের 'ঘোড়ার পিঠে ছুটে আসছে ধুলো-ভরা শূন্যতা', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'একটি সাদা ঘোড়া দূরে দাঁড়িয়ে, আমি যাব কি না ভেবে দেখছি', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'লোহার ঘোড়া ছুটছে শহরের বুক চিরে' প্রভৃতি পংক্তি কবিতার বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাকে বাড়িয়ে দেয় নিঃসন্দেহে এবং কাব্য-পাঠ শুধুমাত্র নান্দনিক হয়েই থেমে থাকে না। বরং রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সুযোগও এনে দেয়। বাংলা ছোটগল্পেও আমরা লক্ষ করি, বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে বহু গল্পকার প্রতীকের মাধ্যমে সমাজ-মানসিকতা ও অস্তিত্বের টানাপোড়েনকে চিত্রায়িত করেছেন। ঘোড়া এমনই এক প্রতীক, যার মাধ্যমে আধুনিকতার রকমফের, মানসিক গতি, ঐতিহাসিক অবস্থিতি ও শ্রেণী সচেতনতা ফুটে ওঠে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'ঘোড়া' গল্পেও ঘোড়া কেবল বস্তুনিষ্ঠ নয়, বরং চরিত্রটির 'অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা'র অংশ। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের আলোচ্য গল্পেও ঘোড়া তেমনি একটি বহুমাত্রিক চিহ্ন। এটি কেবল বাহন নয় – এটি বহন করে একটি সময়, অভিজ্ঞতা ও মানবিক সত্তার বহুস্বরিক প্রতিধ্বনি। 'এবং সাম্প্রতিক ভাবনা এবং মাংসখেকো ঘোড়া' নামক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রতন কুমার দাস বলেন তাই : "সমাজে পৃথিবীর আধুনিক বৈশ্যরূপ স্থাপনের যে নিঃসীম, নিঃশব্দ আয়োজন, যার প্রতীকী বাহক এক মোহময়ী ঘোড়া, তার পেছনেই রয়েছে বৃহত্তর আরো বৃহত্তম নির্মাণকারী মানুষদের অন্ধকার অস্তিত্ব। সাধবাবু এই অন্ধকারের ছবিই আঁকতে চেয়েছেন আখ্যানে, ভাষায়, শব্দে।" ৭

কথাশিল্পী সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর গল্পে শুধু কথা দিয়ে কথা তৈরি করেন না, পাশাপাশি তিনি একটি বার্তাও তৈরি করেন গল্পের ভেতরে। সাধন চট্টোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন : "চৈতন্য নতুন নতুন ভাবে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বোঝাপড়া সেরে নিজেকে বদলাচ্ছে, জগৎকে দেখছে নতুন নতুন ভাবে। মানুষের চেতনার মধ্য দিয়েই তো বস্তুজগৎ বারে বারে নতুন সাজে বেঁচে ওঠে। মানুষ যে পৃথিবীর সত্তাকে বার বার বাঁচিয়ে তুলতে অপরিহার্য, শিল্পই তার বারে বারে ঘোষণা করে" ('কাহিনির মরীচিকায় পাঠকের চৈতন্য', 'গল্প ৫০')। তাঁর অনুচিন্তনে, অনুধাবনে, অভিনিবেশে, সংবেদনায় এমন এক সদর্থক প্রতিশ্রুতিগর্ভ আকাঙ্ক্ষা ফুটে ওঠে যে, জীবনদৃষ্টির নতুন এক পরিসর যেন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। জীবন-মৃত্যুর অভিঘাতেও নির্মোহ প্রতিবেদন তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত বলেই গল্পের কায়াতে খুঁটি-নাটি বর্ণনা তিনি হয়তো খুব একটা করতে চান না। কিন্তু গল্পের ছায়াতে আমরা নানা ধরণের অবয়ব লক্ষ করি। লক্ষ করি, কীভাবে প্রায় শ-আড়াই বিজ্ঞাপনের কাজ করতে গিয়ে বিজলিপদরা পেছল বিম বা তেতে থাকা লোহার রডের ওপর দিয়ে হেঁটেছে, কাঠের ফ্রেমে জল বাতাসের তাড়নায় জন্মানো চারাগাছ ছিঁড়েছে.... কিন্তু তারপরও কোম্পানির কর্তারা বিজলির হাত কাটার কাহিনি বিশ্বাস করে না। ঠিক যেমন বিশ্বাস করতে চায় না পুলিশ কিংবা নাগরিকরাও। নিজ নিজ স্বার্থের তাগিদেই কি তা হয়ে ওঠে! কেন না, আমরা জানি গ্রামশির প্রতাপের সেই তত্ত্ব-সূত্র : "The directedness of power in power relations attempts to maintain the balance of power" ('Antonio Gramsci Beyond Marxism and Postmodernism', Renete Holub, 2014).

কিন্তু আমরা এটাও জানি, রুদ্ধতার পক্ষে প্রতাপ (দৃশ্য বা অদৃশ্য) সমস্ত সামর্থ্য নিয়ে দাঁড়ালেও চলমান জীবনই শেষ কথা বলে। তাই বিপন্ন সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও পণ্যসর্বস্বতা ও বিজ্ঞাপন সংস্কৃতির ভোগবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চান সাধন। আসলে, বিশ্বাসের জায়গাটা তৈরি করতে চান সাধন পাঠকের চেতনায়। মানবিক অনুভূতিতে জাগিয়ে তুলতে চান শিহরণ। যা অনুরণন তুলবে স্থবির হয়ে যাওয়া লাভালাভের হিসেবকারী আধিপত্য সঞ্চারী মননেও। জীবনানন্দীয় ভাষায়, 'আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই' বলেই মৃতপ্রায় জীবনে মৃত্যুটাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে বাধ্য হওয়া সেই মূক মুখগুলিতে সাধন তুলে দিতে চান সহ্য করার অপরিসীম শক্তি। শক্তি প্রতিবাদের – শক্তি প্রত্যাখ্যানের। এবং যে শক্তি তাদের অবস্থান চিহ্নিত করবে না শুধু – দেবে প্রতিরোধের সাহসও। কেন না, 'প্রাণ মানুষের প্রিয়।' সেই প্রিয় প্রাণকেই নিঃশেষে ক্ষয় হতে দিতে চান না সাধন। তাই প্রাণকে বাঁচানোর দায় অনুভব করেন তিনি। লেখায় সেই অভিজ্ঞতাকেই শিল্পায়িত করেন। সেই দায় কি আমাদেরও নয়!

উল্লেখ সূত্র :

১□ বসু সমরেশ, ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৯, অষ্টম মুদ্রণ - ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ৮

২□ Krishnaswamy N., Varghese John, Mishra Sunita, ‘Contemporary Literary Theory', Macmillan, New Delhi - 1, 1st Edition, Page - 59

৩□ সামন্ত সুবল (সম্পাদনা), ‘বাংলা গল্প ও গল্পকার’ ৩য় খণ্ড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা - ৯০, প্রথম প্রকাশ - ২০০০, পৃষ্ঠা - ৮৮-৮৯

৪□ দাশগুপ্ত বাসব (সম্পাদক), ‘নীললোহিত’ সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, নীললোহিত প্রকাশনী, কলকাতা - ৪৯, দশম সংখ্যা - ২০০২, পৃষ্ঠা - ৭৪

৫□ দাশগুপ্ত বাসব (সম্পাদক), ‘নীললোহিত’ সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, অনুরূপ, পৃষ্ঠা - ১০৭

৬□ দাশগুপ্ত বাসব (সম্পাদক), ‘নীললোহিত’ সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, অনুরূপ, পৃষ্ঠা - ৫৫

৭□ দাশগুপ্ত বাসব (সম্পাদক), ‘নীললোহিত’ সাধন চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, অনুরূপ, পৃষ্ঠা - ৩১৪

আকর গ্রন্থ :

১□ চট্টোপাধ্যায় সাধন, ‘গল্প ৫০’ (‘মাংসখেকো ঘোড়া’), প্রকাশ ভবন, কলকাতা - ৭৪, প্রথম সংস্করণ - ২০০৯